ব্যাকটেরিয়াজনিত কুঁড়ি পচা রোগের প্রতিকারের জন্য নিমখইল ব্যবহার এবং স্ট্রেপ্টোসাইক্লিনের (এক গ্রাম প্রতি ১০ লিটার জলে) জলীয় দ্রবণ স্প্রে করতে হয়।

কীটশত্রু নিয়ন্ত্রণের জন্য আগে বলা পরিচর্যাগত ব্যবস্থাপনা গ্রহণ ছাড়াও (১) শুধুমাত্র পরপর ৪-৫ দিন পরিষ্কার ঠান্ডা জল ছিটিয়ে মাকড়ের প্রকোপ উপদ্রব অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। (২) হলুদ রঙের চটচটে আঠালো ফাঁদ ব্যবহার করে জাব, লেদা ও চিরুনি পোকার উপদ্রব অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। (৩) কন্দ শোধনের জন্য ছত্রাকনাশক ছাড়াও ৫০ গ্রাম প্রতি কেজি বীজকন্দ কার্বোসালফান দিয়ে শোধন করে কন্দকে কীটমুক্ত করা যায়। (৪) নিমখইল ব্যবহার এবং রোপণের ঠিক আগের মরসুমে গাঁদাফুল বা ভুট্টার চাষ করে এবং চাষের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে গাঁদা ফুলের অন্তর চাষ এবং ধানের তুষ বা কাঠের গুঁড়ো আচ্ছাদন হিসাবে ব্যবহার করে এবং আক্রান্ত গাছ ও কন্দ পুড়িয়ে নষ্ট করে নিমাটোডের আক্রমণ অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

কীটশত্রু আক্রমণের প্রাথমিক অবস্থায় নিমজাত কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে। জীবাণুজাত কীটনাশক যেমন বি.টি., এন.পি. ভাইরাস বা বিউভেরিয়া ব্যাসিয়ানা ছত্রাকের সঠিক ব্যবহার করে লেদা পোকা, কুঁড়ি ছিদ্রকারী পোকা, চিরুনি পোকা ও জাব পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

প্রজ্জ্বল, শৃঙ্গার, সুভাষিণী প্রভৃতি নিমাটোডের আক্রমণ সহনশীল জাতের ব্যবহার এবং জৈব নিমাটোড-নাশক হিসাবে মাটিতে রজনীগন্ধা পাতার নিমাটোড নিয়ন্ত্রণে কন্দ থেকে গাছ বের হওয়ার পর ১৫-২০ দিন অন্তর তিন-চার বার ০.২ শতাংশ হারে মনক্রোটেস্ বা ট্রায়াজোফস স্প্রে করা যায়। তবে মাটির নিমাটোড দমন করার জন্য প্রতি গাছের গোড়ায় ২ গ্রাম হারে কার্বোফুরান প্রয়োগ করতে হয়।

কীটশত্রু নিয়ন্ত্রণে শেষ উপায় হিসাবে নিরাপদ ও কম বিষযুক্ত রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে। লেদা পোকা, ঘাসফড়িং, কেড়ি পোকা, জাব পোকা, কুঁড়ি ছিদ্রকারী পোকা, চোষী পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ০.২৫ শতাংশ কার্বারিল বা ০.১ শতাংশ ট্রায়াজোফস্, ০.১ শতাংশ কার্বোসালফান বা ০.১৫ শতাংশ প্রোফেনোফল স্প্রে করা যায়, আর মাকড়নাশক হিসাবে ০.১ শতাংশ ইথিয়ন বা ০.১৫ শতাংশ ডাইকোফল বা ০.২ শতাংশ অ্যাবামেক্টিন স্প্রে করতে হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে কার্যকারিতা পেতে এই ফসলে যে কোনো জলীয় কীট/রোগনাশক আঠা (স্টিকার/স্প্রেডার) সহ স্প্রে করা দরকার।

একই জমিতে তিন বছরের বেশি সময় ধরে রজনীগন্ধার চাষ করা উচিত নয়।

গাঁদা ফুলের চাষ

পরিচিতি ও অর্থকরী এবং বহুল ব্যবহৃত ফুলের মধ্যে গাঁদা অন্যতম জনপ্রিয় ফুল। সারা বছর ধরে চাষ করা গেলেও শীতকালে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে গাঁদা ফুলের চাষ হয়। সহজ চাষ পদ্ধতি, বিভিন্ন কৃষি পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা, চাষের কম খরচ, ফুলের আকার ও রঙের বৈচিত্র্য, গাছ থেকে তোলার পর ফুল দীর্ঘদিন রাখা যায় বলে দেশীয় বাজারে গাঁদা ফুলের এত কদর। কুচো বা খুচরো ফুল হিসাবে নানাভাবে ব্যবহার ছাড়াও ওষুধ, রং সুগন্ধী ও প্রসাধনী শিল্পে এই ফুলকে নানা প্রকার কাজে লাগানো হচ্ছে। পুজো, বিয়ে প্রভৃতি ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে মালা তৈরিতে, গাড়ি, তোরণ ও মণ্ডপসজ্জায় গাঁদা ফুলের ব্যবহার বেড়ে চলেছে। হৃদরোগ, চক্ষুরোগ ও চর্মরোগের ওষুধ, বার্ধক্য প্রতিরোধী ও ক্যানসার প্রতিরোধী পথ্য, প্রসাধনী পণ্য তৈরির উপাদান গাঁদা ফুলে স্থিত ক্যারোটিন সমৃদ্ধ রঞ্জক পদার্থ 'লিউটিন' থেকে উৎপাদন করা হয়। প্রাকৃতিক আবীর, হাঁস-মুরগির খাবার, ভেষজ কীটনাশক, উদ্বায়ী সুগন্ধী তেল তৈরি করার জন্য গাঁদা গাছের ফুল ও পাতা ব্যবহার করা হচ্ছে। বিভিন্ন ফসলের নিমাটোড (মাটির কৃমি) ও টম্যাটোর ফল ছিদ্র কারী পোকা নিয়ন্ত্রণে সাথী ফসল হিসাবে এই গাছ ও ফুলের কার্যকরী ভূমিকা আছে। চাহিদা মেটানোর জন্য আমাদের রাজ্য থেকে প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে গাঁদা ফুল পাঠানো হয়।

জাত প্রকরণ : ব্যবসাভিত্তিক চাষে সাধারণত দু-রকমের গাঁদা ফুল ব্যবহার করা হয়। গাছের আকার, উচ্চতা, ফুলের রং ও আকারের ভিন্নতা অনুযায়ী প্রধানত আফ্রিকান গাঁদা ও রক্ত বা ফরাসি গাঁদা-এই দুই শ্রেণির গাঁদার চাষ করা হয়।

ক) **আফ্রিকান গাঁদা :** গাছের আকার বড়, উচ্চতা ৬০-৯০ সেমি. পর্যন্ত হয়, ফুল গোলাকার, মাঝারি থেকে বড় (ব্যাস ৬-১০ সেমি), রং হালকা হলুদ, বাসন্তী, গাঢ় হলুদ থেকে শুরু করে গাঢ় কমলা পর্যন্ত হয়। এখন মাখন-সাদা রঙের গাঁদাও পাওয়া যাচ্ছে। এই শ্রেণির জাতের মধ্যে ক্র্যাকার জ্যাক, পুসা বাসন্তী, পুসা নারঙ্গী, গোল্ডেন জুবিলি, গোল্ডকয়েন নিকস্, গোল্ডেন ইয়োলো, ফায়ার গ্লো, গোল্ডেন মিক্স, ভ্যানিলা (মাখন সাদা) উল্লেখযোগ্য।

খ) **ফরাসি বা রক্তগাঁদা :** গাছ বেঁটে আকৃতির (২০-৩০ সেমি উঁচু), প্রচুর শাখা-প্রশাখাযুক্ত, ঝোপালো, পাতা গাঢ় সবুজ রঙের, ফুলের আকার ছোট, ফুলের রং খয়েরি, হলুদ বা হলুদ ও খয়েরী মিশ্রিত। এই শ্রেণীর গাঁদার মধ্যে রেড ব্রোকেড, সাফারি মিকস্, স্টার অব ইন্ডিয়া, হনিকম্ব, জিপসি, হেরো মিকস্ প্রভৃতি জাতের নাম করা যায়।

এছাড়া বেঁটে ও প্রথম প্রজন্মের সংকর বা হাইব্রিড জাতের মধ্যে ইন্‌কা, গ্যালর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সিরাকোল জাতটি কৃষকদের কাছে খুবই পরিচিত যা প্রায় সারা বছর ধরে চাষ করা যায়।

চাষ পদ্ধতি :

জমি ও মাটি : প্রায় সব ধরনের মাটিতে গাঁদাফুলের চাষ করা যায়। উঁচু বা মাঝারি অবস্থানের জলসেচ ও জল নিকাশের সুব্যবস্থা যুক্ত খোলামেলা সারাদিন আলো পায় — এমন জমি নির্বাচন করতে হবে। ৬-৭ পি.এইচ. মানের

জৈব পদার্থযুক্ত দোআঁশ মাটির জমি গাঁদা চাষের উপযুক্ত। ছায়া পড়ে ও জল জমার সম্ভাবনাযুক্ত জমিতে কখনও গাঁদা চাষ করা উচিত নয়।

চাষের সময় : মৃদু জলবায়ু গাঁদা চাষের পক্ষে উপযুক্ত। সারা বছর ধরে গাঁদা চাষ করা সম্ভব। তবে শীতকালে ফোটা ফুলের জৌলুস ও ফলন বেশি হয়। অন্য সময় ফলন কম হলেও দাম বেশি পাওয়া যায়। মূল জমিতে চারা রোপণের সাধারণত ৬০-৯০ দিন পর (জাত অনুযায়ী) ফুল পাওয়া যায়। অভিজ্ঞ কৃষকগণ ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠানের দিন আগাম দেখে চারা রোপণ করেন। শীতকালীন ফুল নেওয়ার জন্য আশ্বিন-কার্তিক মাসে, গ্রীষ্মকালের ফুলের জন্য মাঘ-ফাল্গুন মাসে এবং বর্ষা ও শরৎকালে ফুল পেতে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে চারা রোপণ করা হয়।

চারা তৈরি : বীজ ও নরম ডগা কলমের মাধ্যমে গাঁদাগাছের চারা তৈরি করা হয়। অনেক সময় বীজ থেকে তৈরি করা চারা থেকে উৎপাদিত ফুলে মা-গাছের সব বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে না। অর্থাৎ বড় ফুলের বীজ নিয়ে বুনলেও সেই চারাতে ছোট, বড় বা মাঝারি সব ধরনের ফুল হতে পারে। বিশেষত আফ্রিকান গাঁদা ও সংকর জাতের বেলায় এই সমস্যা বেশি দেখা যায়। এইসব ক্ষেত্রে নামী বীজ উৎপাদক সংস্থার শংসিত বীজ ব্যবহার করতে হবে। শংসিত বীজ এবং রক্তগাঁদা বীজের চারা থেকে মা-গাছের সমগুণমানের ফুল পাওয়া যায়।

বাণিজ্যিকভাবে আফ্রিকান গাঁদা চাষের ক্ষেত্রে শংসিত বীজ না পেলে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে বীজ বুনে যে চারা তৈরি করা হয়, শ্রাবণ - ভাদ্র মাসে সেই চারার গাছে ফুল ফোটে। ভালো গুণমানের ফুলযুক্ত সতেজ ও নীরোগ গাছ থেকে ডাল বা ডগা কলম করে চারা তৈরি করা হয়। ৬-৮ সেমি লম্বা ডগার ডাল ছত্রাকনাশক দিয়ে শোধন করে পরিষ্কার ও শোধিত ভেজা বালিতে বসিয়ে দিতে হয়। দুই-তিন সপ্তাহের মধ্যে শিকড় গজিয়ে তৈরি চারা রোপণের উপযোগী হয়।

বীজ থেকে চারা তৈরির জন্য বিঘাপ্রতি প্রায় ১০০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন হয়। বোনার আগে ছত্রাকনাশক দিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে। জৈব সার হিসাবে কেঁচোসার বা ভালোভাবে পচা পাতা সার/নারকেলের ছোবড়া বা গোবর সার, নিমখইল এবং নরম ঝুরঝুরে মাটি দিয়ে তিন মিটার চওড়া ও ১৫ সেমি উঁচু বীজতলা তৈরি করা হয়। ছত্রাকনাশক দিয়ে বীজ তলার মাটি শোধন করতে হয়। বীজতলায় ছাউনি দেওয়া দরকার, বীজ বোনার চার-পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে চারা মূল জমিতে রোপণ করা যায়। ছত্রাকনাশক হিসাবে ০.৫ শতাংশ ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি বা ০.১ শতাংশ কার্বেন্ডাজিম ও ম্যানকোজেবের মিশ্রণ ব্যবহার করা যাবে।

জমি তৈরি : চার-পাঁচবার আড়াআড়ি ও লম্বালম্বি গভীর চাষ দিয়ে ১৫-১৬ দিন রোদ খাওয়ানোর জন্য জমি ফেলে রাখতে হবে। মাটি পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে চুন প্রয়োগের দরকার হলে প্রথম চাষের একমাস জমি ফেলে রাখতে হবে। মাটি পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে চুন প্রয়োগের দরকার হলে প্রথম চাষের একমাস আগে মাটির সঙ্গে সুপারিশমতো চুন মেশাতে হবে। প্রথম চাষের সময় জৈব সার হিসাবে ভালোভাবে পচা গোবর বা খামারজাত সার এবং নিমখইল প্রয়োগ করা হয়।

এরপর ভালোভাবে আগাছা বেছে আবার চাষ ও মই দিয়ে জমি সমান করা হয়। পরিচর্যার সুবিধার জন্য মূল জমিকে ১.৫ মিটার চওড়া এবং ১০ মিটার লম্বা কেয়ারিতে ভাগ করা হয়। চলাফেরা ও পরিচর্যার জন্য লম্বালম্বি দুটি কেয়ারির মধ্যে ৬০ সেমি চওড়া ফাঁকা জায়গা রাখতে হবে।

চারা রোপণ : চাষের মরসুম ও জাত অনুসারে চারা রোপণ করা হয়। আফ্রিকান শ্রেণির গাঁদার ক্ষেত্রে সারি থেকে সারি ৪০-৪৫ সেমি এবং প্রতি সারিতে ৩০-৪৫ সেমি দূরত্বে গাছ রোপণ করা হয়। ফরাসি বা রক্তগাঁদা সারি ও গাছ উভয় দিকে ২৫-৩০ সেমি দূরত্বে রোপণ করা হয়। প্রতি বিঘাতে রোপণ করার জন্য প্রায় ৬০০০টি আফ্রিকান গাঁদা চারা এবং প্রায় ১২,০০০টি ফরাসি গাঁদা চারা দরকার হয়। বিকেলবেলায় গোড়ার শিকড়ে কিছুটা মাটি লেগে থাকা অবস্থায় চারা রোপণ করা হয়। এরপর চারপাশের মাটি হাত দিয়ে ভালোভাবে চেপে দিতে হয়।

সার ও সার প্রয়োগ পদ্ধতি : প্রথম চাষের সময় বিঘাপ্রতি চার টন পচা বা খামারজাত সার বা দুই টন কেঁচো সার এবং ১০০ কেজি নিমখইল প্রয়োগ করতে হবে। প্রাথমিক সার হিসাবে বিঘাপ্রতি ১৩ কেজি নাইট্রোজেন (প্রায় ২৯ কেজি ইউরিয়া), ১২ কেজি ফসফরাস (৭৫ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট) এবং ৭ কেজি পটাশ (প্রায় ১২ কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ) ঘটিত রাসায়নিক সার শেষ চাষের সময় কেয়ারিতে প্রয়োগ করা হয়। সর্বদা মাটি পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হয়।

চাপান সার প্রয়োগ : চারা রোপণের তিন এবং ছয় সপ্তাহ পর দুবারে চাপান সার প্রয়োগ করা হয়। চাপান সার হিসাবে প্রতিবারে ৭ কেজি নাইট্রোজেন (প্রায় ১৫.৫০ কেজি ইউরিয়া) এবং ৩ কেজি পটাশ (৫ কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ) ঘটিত সার প্রয়োগ করা হয়।

জীবাণু সার প্রয়োগ : মূল সার হিসাবে রাসায়নিক সার প্রয়োগের ৬-৭ দিন পর প্রতি বিঘা জমির জন্য ৮০০ গ্রাম অ্যাজাটোব্যাক্টর ও ফসফেট দ্রাবক জীবাণুর সংমিশ্রণ ৮-১০ কেজি ছাই বা ভালোভাবে পচা গোবর সার বা কেঁচো সারের সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করা যাবে।

এছাড়া প্রতিবার চাপান সার প্রয়োগের ৬-৭ দিন পরে ৫০০ গ্রাম জীবাণু সার আগে বলা পদ্ধতি অনুসারে অথবা জলে মিশিয়ে বিকালবেলায় স্প্রে করা যাবে। জীবাণু সার ব্যবহার করে রাসায়নিক নাইট্রোজেন ও ফসফরাস-ঘটিত সার প্রয়োগের পরিমাণ প্রায় ৩০ শতাংশ কমানো যায় এবং এই ফসল চাষে রোগের প্রকোপ কম হয়।

বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক ও অনুখাদ্যের ব্যবহার : গাঁদা ফুলের গুণগত উৎকর্ষতা বাড়ানোর জন্য জৈব বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক (এন-ট্রায়াকন্টানল) কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। এইজন্য ফাইটোনল এম.আই. (ফ্লোরিকালচার) সঠিক মাত্রায় (এক মি.লি. প্রতি ৫ লিটার জলে) চারা রোপণের তিন সপ্তাহ অন্তর দুবার বিকেলবেলায় স্প্রে করা যায়। এছাড়াও প্রয়োজন অনুযায়ী অনুখাদ্য (বোরন, দস্তা প্রভৃতি) প্রয়োগ করতে হয়।

অন্তর্বর্তী পরিচর্যা :

জলসেচ ও জলনিকাশি ব্যবস্থাপনা : চারা রোপণের পরেই একটি হালকা সেচ দিতে হবে। গাছের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে

জলের চাহিদা বাড়ে। মাটি, আবহাওয়া ও গাছের অবস্থা অনুযায়ী জল দিতে হয়। জমিতে রসের অভাব বা আধিক্য যাতে না থাকে, তা খেয়াল রাখা প্রয়োজন। সাধারণত গরমকালে ৭-৮ দিন অন্তর এবং শীতকালে ১৫-২০ দিন অন্তর সেচ দেওয়া হয়। অনুসেচ ব্যবস্থার বিন্দু বিন্দু বা ড্রিপ পদ্ধতিতে সেচ দিয়ে প্রায় ৫০ শতাংশ পর্যন্ত জলের খরচ বাঁচানো যায়। হঠাৎ বেশি বৃষ্টি হলে দ্রুত জল নিকাশের ব্যবস্থা করা দরকার।

আগাছা দমন : গাঁদার জমি সর্বদা আগাছামুক্ত রাখতে হবে। চারা রোপণের তিন ও ছয় সপ্তাহ পরে চাপান সার প্রয়োগের আগে ও প্রতিবার সেচ দেওয়ার পর নিড়ানি দিয়ে জমির আগাছা বাছতে হয় এবং প্রয়োজনে গাছের গোড়ায় হালকা মাটি দিতে হয়।

বিশেষ পরিচর্যা

(ক) **ঠেকনা দেওয়া :** বর্ষাকালে বিশেষত আফ্রিকান গাঁদাগাছের ক্ষেত্রে গাছের বৃদ্ধি ও ডালপালা বেশি হয়, এই সময় গাছের গোড়ায় প্রয়োজনীয় মাটি দেওয়া ছাড়াও প্রতিটি গাছের পাশে একটি কাঠি পুঁতে গাছের সঙ্গে বেঁধে দিতে হয়।

(খ) গাছের ডগা ও প্রথম কুঁড়ি ছাঁটাই : চারা রোপণের এক মাসের মাথায় গাছের ডগা ছেঁটে ফেলতে হয়। গাছে কুঁড়ি এলে তা কেটে ফেলা দরকার। এই পদ্ধতি অবলম্বনে ফুল আসা কিছুটা পিছিয়ে গেলেও গাছের ডালপালা বেশি হয়, গাছের সবলতা বাড়ে এবং গাছপ্রতি ফুলের সংখ্যা বেশি হয়।

ফুল তোলা : সাধারণত চারা রোপণের ৬০-৯০ দিন পরে (জাত অনুযায়ী) গাছ থেকে ফুল তোলা শুরু হয়। প্রায় ৫০-৬০ দিন ধরে ফুল পাওয়া যায়। সকালে বা শেষ বিকালে পরিণত ফুল তোলা দরকার। হাত দিয়ে না তুলে কাঁচি দিয়ে কেটে বোঁটা-সহ ফুল তুলতে পারলে ভালো হয়। কাগজ বা কাপড় দিয়ে মোড়া বাঁশের ঝুড়ি অথবা পলিথিন বা কাপড়ের পুঁটলিতে ফুল ভরে খুচরো বা কুচো অবস্থায় বা কুড়িটি ফুল দিয়ে মালা গেঁথে নিকট বা দূরবর্তী বাজারে পাঠানো হয়। বাঁশের ঝুড়ি বা কাপড়ের পুঁটলির চেয়ে প্লাস্টিকের হালকা চৌকোনা ঝুড়ির ব্যবহার অনেক সুবিধাজনক।

ফলন : বিঘাপ্রতি রক্তগাঁদার গড় ফলন ১০-১৫ কুইন্টাল এবং ফরাসি গাঁদার ফলন ১৫-২০ কুইন্টাল।

রোগপোকা ও শস্যরক্ষা পদ্ধতি

রোগ :

গাঁদার বিভিন্ন রোগের মধ্যে চারা ধসা, গোড়া পচা ও কুঁড়ি পচা ফসলের মারাত্মক ক্ষতি করে।

চারা ধসা : ছত্রাকঘটিত এই রোগে বীজতলায় চারাগাছ হঠাৎ ঢলে পড়ে। গাছ ও মাটির সংযোগস্থল সংকুচিত হয়। ওই স্থানে কালো বাদামি দাগ দেখা যায় এবং গাছ মরে যায়।

গোড়া পচা : মাটিবাহিত ছত্রাকজনিত এই রোগ বর্ষাকালে বেশি দেখা যায়। মূল জমিতে চারা থেকে বাড়ন্ত গাছ

বেশি আক্রান্ত হয়। গাছের নিচের কাণ্ড ও গোড়ায় প্রথমে জল ভেজা দাগ, পরে বাদামি কালচে গোলাকার দাগ হয় এবং শেষে গাছ ঢলে পড়ে।

পাতায় দাগ ও পাতা ধসা : ছত্রাকঘটিত এই রোগ আক্রান্ত গাছের পাতায় গোলাকার বাদামি বা খয়েরি ধূসর রঙের ছিট ছিট দাগ হয়। এই দাগগুলি সমগ্র গাছে ছড়িয়ে পড়ে এবং পাতা ঝরে যায়।

কুঁড়ি পচা : এই রোগটি ছত্রাকঘটিত। আক্রান্ত কুঁড়িতে প্রথমে গাঢ় বাদামি দাগ হয়। এই কুঁড়ি ও পাপড়িগুলি পরে কালো ও বিকৃত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়।

পাউডারি মিলডিউ (গুঁড়ো ছাতা পড়া রোগ) : এই রোগে আক্রান্ত গাছের পাতায় সাদা সাদা দাগ হয়। পরে সমগ্র গাছ সাদা গুঁড়োয় ঢেকে যায়। পাতা ও গাছের রং ধূসর ও বিবর্ণ হয়ে যায়।

এছাড়া কখনোও গাঁদাগাছ ব্যাকটেরিয়াজনিত ঢলে পড়া এবং ভাইরাসঘটিত পাতা কোঁকড়ানো ও গাছ বসে যাওয়া রোগে আক্রান্ত হয়।

কীটশত্রু :

গাঁদাগাছের বিভিন্ন কীটশত্রুর মধ্যে লাল জালবোনা মাকড়, শুঁয়োপোকা, জাব পোকা ও থ্রিপ্‌স বেশি দেখা যায়।

জাব পোকা : সবুজ বা কালচে রঙের ক্ষুদ্রাকার জাব পোকা ঝাঁকে ঝাঁকে গাছের কচিপাতা, ডগা, কুঁড়ি ও ফুল থেকে রস চুষে খায়। আক্রান্ত গাছ দুর্বল হয়, ফলন কমে যায়।

থ্রিপ্‌স : অতিক্ষুদ্র আকারের সাদা চঞ্চল কালো রঙের থ্রিপ্‌স বা চিরুনি পোকায় আক্রান্ত হলে গাঁদাগাছের খুব ক্ষতি হয়। এই পোকার পূর্ণাঙ্গ ও অপূর্ণাঙ্গ দশা পাতার রস চুষে খায়, পাতা কুঁকড়ে যায়। গাছ ডগা থেকে নিচের দিকে শুকিয়ে যায়।

লাল জালবোনা মাকড় ও হলুদ মাকড় : এরা গাঁদাগাছের মারাত্মক কীটশত্রু। অতিক্ষুদ্র লাল বিন্দুর মতো দেখতে পাতার নিচে সূক্ষ্ম জাল বোনে। জালের মধ্যে কচি ও পুরনো পাতার কিনারে বা নিচ থেকে রস চুষে খায়। পাতার উপর সাদাটে ঘামাচির মতো ছিট ছিট দাগ দেখা যায়। বেশি আক্রমণে গাছ মরে যায়।

এছাড়া এক ধরনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হলুদ মাকড় কেবলমাত্র কচিপাতার রস চুষে খায়। আক্রান্ত পাতা তামাটে রঙের হয়। গরম ও শুকনো আবহাওয়াতে এই মাকড়ের আক্রমণে গাছ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। অনেক সময় ঘাস ফড়িং, শুঁয়োহীন ও শুঁয়োযুক্ত লেদা পোকা গাছের পাতা ও ফুল খেয়ে নষ্ট করে।

সুসংহত পদ্ধতিতে গাঁদার রোগ ও কীটশত্রু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা :

রোগ ও কীটশত্রু নিয়ন্ত্রণের জন্য কেবলমাত্র বিষাক্ত রাসায়নিক কীট / ছত্রাকনাশক ব্যবহার না করে সুসংহত উপায়ে এই শস্যশত্রু নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা দরকার।

পরিচর্যাগত ব্যবস্থাপনা যেমন উঁচু, খোলামেলা ও জলনিকাশের সুব্যবস্থাযুক্ত জমি নির্বাচন, রোগ/পোকা

সহনশীল ও শংসিত জাতের বীজ ব্যবহার, নীরোগ উৎস থেকে বীজ সংগ্রহ, বীজ ও চারা শোধন, প্রয়োজনে জমিতে চুন প্রয়োগ, চারা রোপণের আগে জমিকে রোদ খাওয়ানো, আগাছা নিয়ন্ত্রণ, প্রয়োজনমতো জলসেচ এবং সেচের অতিরিক্ত জল নিষ্কাশন, অনুসেচের ব্যবস্থাপনা, সারি বরাবর আচ্ছাদনের ব্যবহার, ভাইরাস ও অতি রোগাক্রান্ত গাছ জমি থেকে সমূলে তুলে পুড়িয়ে ফেলা, অতিরিক্ত নাইট্রোজেনঘটিত সারের ব্যবহার না করা, পটাশ, ফসফরাস ও অনুখাদ্য সারের সুষম ব্যবহার সুনিশ্চিত করা, জৈব সার — কেঁচো সার, নিমখইল, জীবাণুসার এবং ভালোভাবে পচা গোবর সুষম ব্যবহার প্রভৃতি ব্যবস্থাপনা করা দরকার।

প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসাবে বীজ ও মাটি শোধন ছাড়াও বর্ষাকালে ২-৩ সপ্তাহ অন্তর পর্যায়ক্রমে ০.৫ শতাংশ (৫ গ্রাম/লিটার জলে) ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি ও সিউডোমোনাস ফ্লুওরেসেন্স গাছের পাতা ও গোড়ায় সারি বরাবর ব্যবহার করে চারা ধসা, গোড়া পচা, পাতার দাগ ও ধসা, কুঁড়ি পচা, পাউডারি মিলডিউ প্রভৃতি ছত্রাকজনিত রোগ ঠেকানো যায়।

এতে কাজ না হলে ০.১ শতাংশ কার্বেন্ডাজিম ও ম্যানকোজেবের মিশ্রণ গাছে স্প্রে করা যাবে অথবা ০.২৫ শতাংশ মেটাল্যাক্সিল ও ম্যানকোজেবের মিশ্রণ দিয়ে গাছ ও গাছের গোড়া ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।

কুঁড়ি পচা রোগ প্রতিকারে প্রতি ১০ লিটার জলে এক গ্রাম স্ট্রেপটোসাইক্লিন এবং ২ গ্রাম কার্বক্সিনের মিশ্রণ স্প্রে করা যাবে।

কীটশত্রু নিয়ন্ত্রণের জন্য আগে বলা পরিচর্যাগত ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা ছাড়াও শুধুমাত্র পরপর ৪-৫ বার পরিষ্কার ঠান্ডা জল স্প্রে করে মাকড়ের প্রকোপ কিছুটা কমানো যায়। হলুদ রঙের চটচটে আঠালো ফাঁদ ব্যবহার করে জাব পোকা, থ্রিপ্‌স, লেদা পোকার উপদ্রব অনেকটা ঠেকানো যায়।

কীটশত্রু আক্রমণের প্রাথমিক অবস্থায় ভেষজ নিমজাত বা তামাকজাত কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে। জীবাণুজাত কীটনাশক (যেমন বি.টি.এন.পি. ভাইরাস বা বিউভেরিয়া ব্যাসিয়ানা ছত্রাক)-এর সঠিক প্রয়োগে লেদাপোকা, জাবপোকা, থ্রিপ্‌স কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। শেষ উপায় হিসাবে নিরাপদ ও কম বিষযুক্ত রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে। জাবপোকা, চিরুনি পোকা, লেদা পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ০.২৫ শতাংশ কার্বারিল বা ০.১৫ শতাংশ প্রোফেনোফস্ স্প্রে করা যায়। লাল ও হলুদ মাকড় নিয়ন্ত্রণের জন্য ০.১ শতাংশ ইথিয়ন বা ০.১৫ শতাংশ ডাইকোফল বা ০.২ শতাংশ অ্যাবমেকটিন স্প্রে করা হয়।

সঠিক কার্যকারিতা পেতে যে কোনো জলীয় কীট/রোগনাশক আঠা (স্টিকার/স্প্রেডার)-সহ স্প্রে করা দরকার।

একই জমিতে প্রতি বছর বার বার গাঁদাফুলের চাষ করা উচিত নয়।

গ্লাডিওলাস চাষ

জাত : জেশ্চার, হোয়াইট প্রসপারিটি, ক্যান্ডিমা, রেড জিঞ্জার, আমেরিকান বিউটি, ফ্রেন্ডশিপ, সামারসাইন ইত্যাদি।

বংশবিস্তার : কন্দ।

কন্দের সংখ্যা (বিঘা প্রতি) : ২০,০০০-২২,০০০টি।

রোপণের সময় : প্রধানত কার্তিক-অগ্রহায়ণ।

রোপণের দূরত্ব ও গভীরতা : ৩০ সেমি + ১৫ সেমি ও ৭-১০ সেমি।

সার প্রয়োগ (বিঘা প্রতি) : মূলসার হিসাবে ৫ টন জৈবসার, ১২ কেজি নাইট্রোজেন, ১৫ কেজি ফসফরাস ও ১০ কেজি পটাশ জাতীয় সার। চাপান সার হিসাবে ৮ কেজি নাইট্রোজেন ও ৬ কেজি পটাশ জাতীয় সার প্রয়োগ।

এছাড়া সময়মতো অন্তর্বর্তী পরিচর্যা, জলসেচ ও জলনিকাশি ব্যবস্থাপনা এবং সুসংহত উপায়ে রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত জরুরি।

new corm
cormels
old corm
fibrous roots

জারবেরা চাষ

পলিহাউস ও তার পরিবেশ : পলিহাউসে জারবেরা চাষ সফলভাবে করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি গুরুত্বসহকারে দেখা উচিত :

১। পলিহাউসের উচ্চতা ৩.৫-৪.০ মিটার (১১-১৩ ফুট) হতে হবে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ বাতাস চলাচল করার জন্য উপরের দিকে বায়ুচলন ব্যবস্থা রাখতে হবে।

২। বৃষ্টির হাত থেকে গাছকে রক্ষা করার জন্য পলিহাউসের উপর পলিথিন সিট কিংবা U-V স্টেবিলাইজড্ সাদা প্লাস্টিক ফিল্ম (২০০ মাইক্রন) দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

৩। পলিহাউসের ভিতর আলোর তীব্রতা এবং সূর্যরশ্মির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শেডনেট (৫০%) ব্যবহার করতে হবে।

৪। জারবেরা চাষের প্রাথমিক অবস্থায় ২৫-২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা গাছের বৃদ্ধির জন্য এবং পরবর্তী অবস্থায় ২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস ফুল বেরোনোর সময় থাকা দরকার। তাপমাত্রা ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম কিংবা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হলে গাছের পক্ষে ক্ষতিকারক।

৫। জারবেরা চাষের জন্য পলিহাউসের ভিতর সাধারণত ৭০-৭৫% আপেক্ষিক আর্দ্রতা বজায় রাখতে হবে।

মাটি শোধন ও বেড তৈরি : গাছ লাগানোর পূর্বে মাটি অবশ্যই শোধন করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে পলিথিন চাদর দিয়ে ঢেকে (৫-৭ সপ্তাহ) কিংবা ফরমালিন (২%) দ্রবণ দিয়ে মাটি ভিজিয়ে শোধন করা যেতে পারে। বেডের পরিমাপ ৪৫ সেমি (১.৫ ফুট) উচ্চতা, ৬০ সেমি (২ ফুট) চওড়া এবং পলিহাউস অনুযায়ী লম্বা হওয়া প্রয়োজন। পরিচর্যার সুবিধার্থে দুটি বেডের মাঝখানে ৩০ সেমি (১ফুট) ফাঁকা জায়গা রাখা দরকার। আগাছা বেছে বেডের মাটি ঝুরঝুর করে জৈব সার বিশেষত নিম কেক এবং এস এস পি ও ম্যাগনেশিয়াম সালফেট যথাক্রমে ২.৫ কেজি ও ০.৫ কেজি (প্রতি ১০০ বর্গ ফুট) ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। ভালো জলনিকাশি ব্যবস্থাপনার জন্য বেডের নিচে গ্রাভেল কিংবা বালির স্তর দেওয়া যেতে পারে।

গাছ লাগানো ও পরিচর্যা : গাছ লাগানোর সময় মাটির লেভেল থেকে ১-২ সেমি উঁচু করে লাগাতে হবে। একটি বেডের মধ্যে দুটি সারি লাগানো হয় যার দূরত্ব ৩৭.৫ সেমি (১.২৫ ফুট) এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৩০ সেমি (১ফুট)। গাছের গোড়ার মাটি প্রতি ১৫ দিন অন্তর খুঁড়ে দিতে হবে যাতে মাটির ভিতর বাতাস চলাচল স্বাভাবিক থাকে। গাছ লাগানোর পর প্রথম ৪-৫ সপ্তাহ পলিহাউসের মধ্যে সাধারণত ৮০-৮৫% আপেক্ষিক আর্দ্রতা বজায় রাখতে হবে যাতে গাছ শুকিয়ে না যায় এবং আগাছা দেখা মাত্র তুলে ফেলতে হবে।

জলসেচ : গাছ লাগানোর পর থেকে একমাস পর্যন্ত ঝারি কিংবা ওভারহেড স্প্রিংকলারের মাধ্যমে জল দিতে হবে। অতঃপর ড্রিপ সিস্টেমের মাধ্যমে গাছের গোড়ায় জল দেওয়া যেতে পারে। একদিন অন্তর গাছপ্রতি

৫০০-৭০০ মিলি জল দেওয়া প্রয়োজন। অধিক গ্রীষ্মকালে ফগারের মাধ্যমে পলিহাউসের স্বাভাবিক আপেক্ষিক আর্দ্রতা বজায় রাখতে হবে।

সার প্রয়োগ : গাছ লাগানোর প্রথম তিন সপ্তাহের পর থেকে তিন মাস পর্যন্ত এন পি কে (১ : ১ : ১) ০.৪ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে এবং ফুল আসার পর এন পি কে (২ : ১ : ৪) ০.৪ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে গাছপ্রতি একদিন অন্তর প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি দু-তিন সপ্তাহ অন্তর প্রয়োজনমতো অনুখাদ্যের মিশ্রণ প্রয়োগ করতে হবে যাতে গাছের বৃদ্ধির ব্যাঘাত না ঘটে।

ফুল তোলা ও সংরক্ষণ : জারবেরা গাছে প্রথম ফুল আসতে মোটামুটি ৭-৮ সপ্তাহ লাগে। তবে তার আগে ফুল দেখা দিলে অবশ্যই ছিঁড়ে ফেলতে হবে। ফুলের ডাঁটি গাছের গোড়ায় না কেটে এদিক-ওদিক নাড়িয়ে তুলতে হবে যাতে গাছের কোনো ক্ষতের সৃষ্টি না হয়। ফুল সাধারণত সকালবেলা কিংবা বিকালবেলা তুলতে হবে এবং ফুলের ডাঁটির নিচ প্রান্তে তির্যকভাবে কেটে জলের মধ্যে রাখতে হবে। অতঃপর সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড দ্রবণ (১০ মি.লি. প্রতি লিটার জল) কিংবা সাইট্রিক অ্যাসিড ও অ্যাসকরবিক অ্যাসিড (৫ মি.লি. করে প্রতিটি / লিটার জল) মিশ্রণের দ্রবণে রাখতে হবে। এভাবে জারবেরা ফুল ৮-১০ দিন পর্যন্ত সতেজভাবে রাখা যায়।

পোকা ও রোগের দমন : জাবপোকা, চিরুনি পোকা, সাদা মাছি, মাকড় ও নিমাটোড প্রভৃতির আক্রমণে অনেক সময় গাছের বৃদ্ধি ও ফলনের ব্যাঘাত ঘটে। এজন্য সময়মতো উপযুক্ত পরিমাণ জৈব কিংবা রাসায়নিক কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে। জাবপোকা, চিরুনি পোকা ও সাদা মাছি দমনের জন্য ইমিডাক্লোপ্রিড (১৭.৮ এস এল) ১ মিলি প্রতি ৫ লিটার জল অথবা অ্যাসিটামিপ্রিট (২০% এস পি) ১ গ্রাম প্রতি ৫ লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। মাকড়ের জন্য নিমতেল ২ মিলি কিংবা অ্যাবামেকটিন (১.৯% ইসি) ০.৪ মিলি. প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। নিমাটোডের জন্য নিমকেক ৪০-৫০ গ্রাম গাছপ্রতি এবং কার্বফিউরন (৩কেজি) ১০ গ্রাম প্রতি গাছের গোড়ায় চারপাশে ভালোভাবে খুঁড়ে মিশিয়ে দিতে হবে।

বিভিন্ন রোগের মধ্যে শিকড় বা গোড়া পচা, পাতা ও ফুলে দাগ, ব্যাকটেরিয়াল ধসা খুবই মারাত্মক। প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসাবে প্রতি ২-৩ সপ্তাহ অন্তর পর্যায়ক্রমে ০.৫%(৫ গ্রাম/লি.) ট্রাইকোডার্মা ও সিউডোমোনাস গাছের পাতা ও গোড়ায় সারি বরাবর ব্যবহার করে শিকড় বা গোড়া পচা, পাতা ও ফুলের দাগ, ব্যাকটেরিয়াল ধসা প্রভৃতি রোগ ঠেকানো যায়। এতে কাজ না হলে থায়োফেনেট মিথাইল (৭০% ডব্লু. পি.) ২ গ্রাম প্রতি লিটার কিংবা কার্বেন্ডাজিম (১২% ডব্লু. পি.) ও ম্যানকোজেবের (৬৩% ডব্লু. পি.) মিশ্রণ ২ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে গাছের পাতাসহ গোড়া ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।

গোলাপ চাষ

সুন্দর রং, গন্ধ ও গঠনের জন্য বিশ্বের সমস্ত ফুলের মধ্যে জনপ্রিয়তার শীর্ষ স্থানে আছে ফুলের রাশি হিসাবে সমাদৃত এই গোলাপ ফুল। জন্মদিন, বিবাহ, অনুষ্ঠান ছাড়াও এর ওষধি গুণাগুণ এবং সুগন্ধ, বিভিন্ন আয়ুর্বেদিক ওষুধ ও সুগন্ধী দ্রব্য প্রস্তুতিতে এই ফুল বহুল ব্যবহৃত হয়। গোলাপের চাষ আজ সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গায় বাণিজ্যিকভাবে যেমন হচ্ছে, তেমনি দেশীয় বাজারে এর চাহিদা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। তাই পশ্চিমবঙ্গেও গোলাপ চাষ একটি লাভজনক ফুল চাষ।

মাটি ও জলবায়ু : যথেষ্ট জৈব পদার্থযুক্ত বেলে-দোঁয়াশ থেকে দোঁয়াশ-বেলে মাটি উপযুক্ত। উঁচু জমি এবং ভালো বাতাস মেলে, দিনের বেলা যেন গড়ে ৬-৭ ঘন্টা রোদ পড়ে, মাটির পি.এইচ. ৬-৭ এর মধ্যে ও উত্তম জলনিষ্কাশনের ব্যবস্থাযুক্ত জমি এই চাষের জন্য আদর্শ। মাটির অম্লত্ব বেশি হলে চুন এবং কম হলে জিপসাম বা সালফার দিয়ে মাটি সংশোধন করতে হবে। গড় তাপমাত্রা ১০°-২০° সেলসিয়াস ও বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১৫০০ মি.মি. হলে গোলাপ চাষ ভালোভাবে করা যায়।

উন্নত জাত : গোলাপ ফুলের এবং গাছের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, যদিও বর্তমানে সারা পৃথিবীতে ২০ হাজারেরও বেশি জাত বর্তমান। প্রতি বছর ২৫০-৩০০ নতুন জাত বাজারে আসে।

বিভিন্ন ভাগগুলি হল—

১) **হাইব্রিড টি :** এই বিভাগের গাছগুলি শক্ত সব, ঝাঁঝালো স্বভাবের এবং ফুল বেশ বড়সড়, টাটকা চায়ের সুগন্ধযুক্ত হয়। উল্লেখযোগ্য জাতগুলি হল —

মিনুপারলে, ভ্যালেনসিয়া, হোয়াইট প্রিন্স, স্লোগার্ল, ফাস্ট লাভ, ইডেন রোজ ইত্যাদি।

(২) **ফ্লোরিবানডা :** এই বিভাগের গাছ হাইব্রিড টি ও পলিয়েনথা গ্রুপের সংকরায়ণে তৈরি কুইন এলিজাবেথ, সামার স্নো, আইসবার্গ, গোল্ডেন জুয়েল প্রভৃতি হল উন্নত জাত।

(৩) **পলিয়েনথা :** এই বিভাগের গোলাপের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল গাছ অপেক্ষাকৃত ছোট, ফুল থোকায় থোকায় বা এককভাবে সারা বছর ফোটে। ঋষি বঙ্কিম, ক্যাথারিনা হল উল্লেখযোগ্য জাত।

(৪) **পারপিচুয়্যাল :** গাছ বেশ বলিষ্ঠ এবং দীর্ঘদিন ধরে ফুল উৎপাদনে সক্ষম। বড় সাইজের এবং সুগন্ধযুক্ত ফুল উৎপাদন করে এই জাত। আমেরিকান বিউটি হল এর উন্নত জাত।

(৫) **ক্লাইম্বার :** এই বিভাগের গাছগুলি লতানো স্বভাবের। উল্লেখযোগ্য জাতগুলি হল — প্যারেড, প্রসপারিটি, ট্রেমপো, গোল্ডেন শাওয়ার প্রভৃতি।

(৬) **মিনিয়েচার :** এই বিভাগের গোলাপকে বেবি রোজ বলা হয়, কারণ এর গাছ এবং ফুল খুব ছোট হয়। বিভিন্ন জাতগুলি হল — গ্রিন আইস, সান ডাস্ট, ডোয়ার্ফ কুইন প্রভৃতি।

(৭) **গুল্মজাতীয়** : এইগুলি জংলি বা বুনো গোলাপগাছ। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ফুলের জন্য এর চাষ করা হয় না, তবে গোলাপের বংশবৃদ্ধির জন্য 'রুটস্টক' হিসাবে বহুল ব্যবহৃত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের জন্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জাত হল—মিনুপার্লে, এরিজোমা, মন্টেজুমা, দ্যাফ্রান্স, এলিজাবেথ, স্বর্ণরেখা, তাজমহল, হ্যাপিনেস, প্যারাডাইস, বে অফ্ বেঙ্গল প্রভৃতি।

জমি তৈরি : বাণিজ্যিক ভিত্তি গোলাপ চাষের জন্য জমি সমতল করে গোলাপের জাত অনুসারে ১২০-১৫০ সেমি চওড়া এবং সুবিধামত দৈর্ঘ্যের বেড তৈরি করা প্রয়োজন। প্রতিটি বেডে দুই সারি গাছ রোপণ করা যায়। পরিচর্যা করার জন্য দুটি বেডের মধ্যে ৪৫ সেমি চওড়া রাস্তা রাখা প্রয়োজন। বৈশাখের শেষ এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম বেড তৈরির কাজ শেষ করা ভাল। বেডের মধ্যে ৬০ সেমি পরিধিযুক্ত গর্ত করে, সেখানে ৫ কেজি পচা গোবর সার, ১০-১৫ গ্রাম ইউরিয়া, ২৫০ গ্রাম নিমখোল, ২৫-৩০ গ্রাম ফসফেট, ৮-১০ গ্রাম পটাশ, ২ চা-চামচ অনুখাদ্য এবং ৩ চা-চামচ, ২% মিথাইল প্যারাথিয়ন চারা লাগানোর ৭-৮ দিন আগে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

গাছ বসানোর সময় ও দূরত্ব : চারা লাগানোর সময় ও দূরত্ব মূলত নির্ভর করে সেই অঞ্চলের মাটি জলবায়ু এবং গোলাপের জাতের উপর। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে অক্টোবর-জানুয়ারি মাস গাছ লাগানোর আদর্শ সময়। সাধারণত জাত অনুযায়ী হাইব্রিড টি ৬০ সেমি x ৩০ সেমি, ফ্লোরিবান্ডা এবং পলিয়েনথা ৬০ সেমি x ৬০ সেমি, মিনিয়েচার ৩০ সেমি x ৩০ সেমি রাখা চলে। ক্লাইম্বারের ক্ষেত্রে ২-৩ মি x ২-৩ মি. দূরত্বে গাছ বসানো চলে। গর্তে চারা লাগানোর আগে গোড়ার শক্ত মাটির বলটি জলে ভিজিয়ে দলাটি না ভেঙে ভালোভাবে বিকেলে চারা রোপণ করা আবশ্যক, রোপণের পর একটি কাঠির সঙ্গে চারার কাণ্ড বেঁধে দেওয়া প্রয়োজন যেন হাওয়ায় গাছ নড়ে না যায়।

বংশবিস্তার : গোলাপের চারা তৈরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতের জন্য অঙ্গজ পদ্ধতিতে দাবা কলম, শাখা কলম, গুটি কলম, জোড় কলম, মুকুল কলম ইত্যাদি ব্যবহার করা সম্ভব। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষের জন্য মাঘ-ফাল্গুন মাসে মুকুল কলম বিশেষ করে 'টি বাডিং' বা 'শিল্ড বাডিং' বহুল ব্যবহৃত হয় এবং ভালো পদ্ধতি হিসাবে গণ্য হয়। এছাড়া ক্লাইম্বার, পলিয়েনথা এবং মিনিয়েচারের ক্ষেত্রে শাখা কলমও করা হয়।

সার প্রয়োগ : গোলাপগাছ মাটি থেকে রাসায়নিক সার অপেক্ষা জৈব সার অধিক পছন্দ করে। গোলাপের শিকড় খুবই সংবেদনশীল এবং মাটিতে রাসায়নিক সারের মাত্রা বেশি হলে গাছ অকালে মারা যায়। তাই রাসায়নিক সার প্রয়োগে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। গোলাপের চারা রোপণের পর গাছের বৃদ্ধির জন্য প্রথম বছর গাছপ্রতি ১০০ গ্রাম পচা সরিষার খোল এবং ৫০০ গ্রাম পচা গোবর মাটির সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। দ্বিতীয় বছর আশ্বিন-কার্তিক মাসে গাছ ছাঁটাইয়ের ২-৩ দিনের মধ্যে গাছের গোড়ার চারপাশে ১৫-২০ সেমি গভীর করে ৩০-৪০ সেমি পর্যন্ত মাটি সাবধানে তুলে উপর স্তরের শিকড়গুলি উন্মুক্ত করতে হবে। অনাবৃত শিকড় এবং গাছের গোড়ার অংশকে এক-দেড় সপ্তাহ রৌদ্র এবং হিম খাওয়ানো প্রয়োজন। গোলাপগাছের এই পরিচর্যা (wintering) পরবর্তী সময়ে অধিক সংখ্যক ফুল ফোটাতে এবং সাইজ বাড়াতে সাহায্য করে। গাছ ছাঁটাই ও শিকড় অনাবৃত করার ৮-১২ দিন পর গাছপিছু ১$^{১}/_{২}$ কেজি পচা গোবর সার, ১০০ গ্রাম সরষের খোল, ১৫০ গ্রাম হাড়